মায়ের চিঠি ডট কম

চন্দ্রা মজুমদার

এখনও পর্যন্ত কোনও যন্ত্রপাতি চালানো শিখতে পারেননি মনীষা— এজন্য নিজেকে ভারি বোকা মনে হয়। সবাই বলে ব্যাপারটা নাকি কিছু নয়, একটু স্থির ভাবে বসতে হবে, একটু মনোযোগ দিতে হবে— এই যা। তখন মনে হয় বসবার সময় কই, কত কাজ জমে আছে, এখনই হাত হাগাতে হবে। বিকট শব্দে মিক্সি চালিয়ে ওরা সবজির আদা বেটে নিয়ে যায়, এমনকী পিঠে তৈরির চালের গুঁড়ো। এসব জিনিসের কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না মনীষা। যে যাই বলুক যেটা শিলনোড়ায় পেষার জিনিস সেটা ওই মিক্সিতে কোনোমতেই মোলায়ম হয় না। ওই দিয়ে রান্না করলে কী বা স্বাদ হবে? লোকের উৎপাতে ধুয়ে-মুছে ওটাকে চোখের আড়ালে রাখলে কী হবে মাঝে মাঝেই 'মাসিমা মিক্সিটা দিন একবার, অনেকগুলো জিরে ধনে একেবারে গুঁড়িয়ে নেব' শুনতে হয়, বেরও করে দিতে হয়। যন্ত্র মানে নানা রকম সুইচ আর বোতাম টেপাটেপির ব্যাপার, আগেরটা পরে পরেরটা আগে হয়ে গেলও চিত্তির, ওটা-ওঠা আটকে থাকবে, সে এক বিপত্তি। টেলিফোনের নম্বর এখন এত লম্বা হয়ে গেছে, আগের মতো মনে রেখে আর ডায়াল করা যায় না। প্রতিবারেই খাতা দেখতে হয়। আজকাল আবার বাড়ির সাধারণ নম্বর কাউকে দেওয়া যায় না, সবাই ব্যস্ত। বাড়িতে কে কতক্ষণ থাকবে ঠিক নেই, তাদের হাতে পকেটে সর্বদা মোবাইল। ওই নম্বরগুলো আবার বেয়াড়া রকম লম্বা, খাতা দেখে দেখে নম্বর টিপতে গেলেও প্রায়ই আগেপরে হয়ে যায়, তখনকার বুকনি না হয়ে শুনলে নট একজিস্ট, ইয়ে নাম্বার নেহি হ্যায়। আবার বাংলা শোনার আগে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে হয় নয়তো আহ্লাদি গলায় বাংলা বলতে থাকবে—আপনি যে নাম্বারটি চান তার অস্তিত্ব নেই। একটা ল্যাপটপ নাকি খুব সুবিধাজনক—এই বলে গতবার ছেলে একটা এনেছে। ঝাড়ামোছা করে তাকে আলমারিতে রেখেছে মনীষা। এরকম অনেক জিনিস জুটছে শুধু ঝেড়েমুছে তুলে রাখবার জন্য।

এমন কিছু পুরনো লোক মনীষা নন। ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়াশুনাও করেছেন। প্রয়োজনবোধটা আধুনিকতার আগ্রাসনের পূর্বের দিনগুলোতেই স্থির হয়ে আছে। এখনকার সব কিছু যেন কেমন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। গান শোনার জন্য একটা রেডিও তাদের সময় যথেষ্ট ছিল। মানুষের মনের কথা ওরা বুঝতেন, কত যে সুন্দর অনুষ্ঠান হত! সকাল দুপুর বিকেল রাত—এমন সুন্দর সব প্রোগ্রাম থাকত যে ছেলে, বুড়ো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মহিলা-পুরুষ—কেউই বঞ্চিত হত না, এল চমৎকার রেকর্ড প্লেয়ার। পছন্দমত রেকর্ড চাপিয়ে উল বুনে, গল্প করে নয়তো শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বড় আরামে দিন কাটত। রেকর্ড চেঞ্জার পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক ছিল এমনকী প্রথম যুগের টিভির সঙ্গেও ভালোই বনিবনা ছিল—সুইচটা শুধুই অন আর অফ করা। আর এখন? রিমোটের অসংখ্য লালনীল বুটিদানা—সবগুলোর কার্যকলাপ কোনওদিনই রপ্ত হওয়ার নয়।

অনেকদিন পর ছেলে বাড়িতে এসেছে, তাড়াহুড়ো করে কোথায় বের হচ্ছে এখনই। মনীষা একটা শার্ট বের করতে গেলেন আলমারি থেকে। মেঝেতে গোটা তিনেক শার্ট পড়ে আছে। একবার পরার পর শাড়িটা ভাঁজকরে রাখলে আরও ক'বার পরা যায়। কিন্তু শার্টগুলো একবার পরলেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে। আলমারিটায় প্রচুর জিনিস ভাঁজ করা সুবিধামতো কিছুই হাতে উঠছে না। বাড়িতে তো থাকে না, দীর্ঘদিন বিদেশে। ওর জামাকাপড় এখানে বেশি কিছু নেইও। 'এখনও পেলে না?' বলে বাথরুম থেকে বের হয়েই আলমারির কাছে এসে একটা শার্ট ধরে টান মারল বুম্বা, সঙ্গে সঙ্গে একথাক শার্ট হুড়হুড় করে নীচে পড়ল। তখন বিরক্ত হয়ে চিৎকার দিল— 'মা, সেই বি.ই. কলেজে যখন প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম, সেই সব শার্ট এমনকি র‍্যাগিং করা সিগারেটের ছাঁকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছিল যেটা—সেটাও রেখেছ? কী হবে ওগুলো? এখন কত মোট হয়ে গেছি, এসব গায়ে লাগে?' তাড়াতাড়ি মনীষা বলেন— 'আরে দাঁড়া না, দিচ্ছি। এইটা পরলে তোকে খুব মানাত, সুন্দর দেখাত' বলে মনীষা যেটা বের করলেন সেটা একটা ছিল জামা অন্তত সাত-আট বছর আগেকার। এবার বিরত হয়ে বুম্বা অন্য তাকগুলো থেকেও টানতে থাকে। সেখানেও ওর স্কুলের ইউনিফর্ম সাদা শার্ট নেভি ব্লু হাফ প্যান্ট, টাই ঝপাঝপ মাটিতে পড়ে। এবার রেগে গিয়ে বলে— 'আচ্ছা এসবের মানে কী?' বলে ছোট্ট একটা হাফ্ শার্ট মায়ের সামনে টানটান করে মেলে ধরে। মায়ের কাঁচুমাচু মুখটা দেখে এবার হাসতে থাকে, রাগের বদলে। তাই দেখে সাহস পেয়ে মনীষা বলেন— 'দেখ কেমন সুন্দর করে রেখেছি সব। নিজে কেচে ইস্তিরি করি, ধোপাকে একটা পয়সাও দিই না।"

— 'সে তো খুব ভালো কথা, কিন্তু কাল রাতে যে একেবারে ঘুমোতে পারিনি তার কী হবে?'

—ওমা সে কীরে আমায় ডাকবি তো? বলবি তো আমাকে।

—এখন বলছি! বিছানায় শোওয়া মাত্র মচমচ, পাশ ফিরি তো মচমচ! খুব টায়ার্ড ছিলাম বলে প্রথমটা উঠিনি। তারপর মনে হল এরকম চলতে দিলে ঘুমের বারোটা। উঠে পড়লাম। তোষকটা তুলে দেখি ভাঁজ করা নানা আকারের ঠোঙা, কিছু পলিথিনের আর কিছু ব্রাউন পেপারের। সেগুলো ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় লেয়ার তুলতে আর এক প্রস্থ! তখন মাথায় খুন চেপে গেছে! তৃতীয় লেয়ারে আরো বিচিত্র জিনিস—ন্যাকড়ার টুকরো নানা মাপের শাড়ির পাড়, দড়ি আর একগাছি সরু ঝাঁটা।'

— 'অ্যাঁ? সব ফেলে দিয়েছিল নাকি? সব ভালো ভালো প্যাকেট, ওসব কত দরকারি! না থাকলে কাউকে কিছু দিতে গেলে হাতড়ে মরতে হয়।'

বুম্বা সুবিধামত একটা শার্ট চাপিয়ে বের হয়ে গেল। এত কাজ জমে আছে। একটু ভালো করে রান্নাও করতে হবে, তার ওপর মেঝেতে ফেলে গেছে স্তূপীকৃত জিনিস। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। ওকে কী করে বলি ওসব জিনিস ফেলে দেওয়া যায় না।স ওদের প্রত্যেকটির সঙ্গে একটা গল্প আছে, সে ওর বেড়ে ওঠার গল্প। ওসবে হাত দিলেই সেই ছোট্ট বুম্বা ছুটে আসে, ওগুলো সমেত বুম্বা ছিল তার নিজের। কিন্তু এখন? ওকে বড় অচেনা লাগে, মনে হয় অন্য ভাষায় কথা বলছে।

সৃষ্টিসন্ধান

এরই নাম বোধহয় বড় হওয়া বা মানুষ হওয়া।

অনেকগুলো লোকের হাঁকডাক আর দুমদাম শব্দে মনীষা বেরিয়ে অবাক— 'এই যে শোনো। তোমার ঠিকানা ভুল করোনি তো? এত বড় আলমারি, আরও দুটো বড় বড় প্যাকেট, এসব কাদের?'

—'আজ্ঞে এ বাড়ির।'

— 'অসম্ভব! আমি জানব না আমার বাড়িতে কী লাগবে?' বুম্বা ইতোমধ্যে উঠে এসেছে, ওদের লিডারকে বলে— 'এখানটায় আলমারিটা বসাও আর বাথরুমের কাছাকাছি থাক ওয়াশিং মেশিন। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আপাতত দরজার পাশে রাখ।' বুম্বার গলা পেয়ে মনীষা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে যান। হইহই করতে করতে বুম্বা রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়— 'মা, জামাকাপড় রাখবার এটা তোমার দ্বিতীয় আলমারি। ওই একটার মধ্যে তোমাকে আর সব কিছু খুঁজতে হবে না। আর এই রইল ওয়াশিং মেশিন। অতবড়ো অপারেশেনের পর বসে বসে ভারি ভারি জিনিস কাচাকাচির পরিশ্রম তোমার বাঁচবে।' ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের একটা জায়গায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে— 'এটার সুইচটা দেবে, নলটা লাগিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাবে, তাতেই ধুলোময়লা পরিষ্কার। সারাদিন ঝুলময়লা ঘেঁটে ডাস্ট অ্যালার্জির হাত থেকে এবার বাঁচবে। চুপ করে আছো কেন? পছন্দ হয়নি?' থতমত খেয়ে যান মনীষা। আমতা আমতা করে উদ্বেগের সঙ্গে কারণটা বলেই ফেললেন— 'না মানে এতগুলো জিনিস যে নিয়ে এলি, এত টাকা পেলি কোথায়?' এবারে হো হো করে হেসে ওঠে ছেলে, মা বোকার মত তাকিয়ে থাকেন। — 'তুমি কি ভেবেছ পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় সর্বদা?' সাহস পেয়ে মা বলেন— 'তবে? এতসব তোকে ওরা ধার দিল নাকি?' আবার হাসে ছেলে— 'তা একে ধার বলতেই পারে!'

— 'এত টাকা খামোকা ধার করলি? এত সব কী হবে?'

মেজাজ অমনি খারাপ হয়ে যায় বুম্বার— 'মানে? তোমার সুবিধের জন্যেই তো এনেছি। এবার মাইক্রোওয়েভ কিনে দিয়ে যাব, রান্নার আর হাঙ্গামা থাকবে না।'

মনীষা আবার বলে ফেলেন— 'তা বলে এত টাকা?'

— 'আরে বাবা ক্রেডিট কার্ড নিয়েছি, ব্যাংক থেকে ওরা আমার সুবিধামত টাকা নিয়ে নেবে।'

মনীষা ভাবতে বসেন। এই বাড়িঘর, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় নিজে ঘষামাজা করে কেচেকুচে ইস্তিরি করে সবার পছন্দমোত রান্না করে খাইয়ে যার এতদিন কাটল—এখন আর কিছুই করতে হবে না? রান্নাটাও মেসিনে হবে? কী ভয়ংকর দিন আসছে সামনে! আর কদিন বাদে মা ওর কে তাই তো ভুলে যাবে। ছোট্ট একটা ব্যাগ হাতে পথে নামতেই বন্ধু করুণা চেপে ধরল। ওর দুটি ছেলেমেয়ে। মেয়ের বিয়ে ভালোই দিয়েছে— তারও ছেলেপুলে আছে আর ছেলেটা মোটামুটি চাকরি করে, পড়াশুনা বিশেষ এগোয়নি, লাভ ম্যারেজ করে অনেক আগেই বউ ঘরে এনেছে, এরও সন্তান দুটি। করুণা সারাদিন ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। মনীষা ভয়ে ভয়ে ছেলেকে একবার বিয়ের কথা বলেছিল, তার উত্তর— 'খেপেছ? জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ওধারে কেউ ঘেঁষে?' ওর মতো প্রতিষ্ঠিত মানে যে কী তা ভগবানই জানেন।

—কী রে? অনেকদিন দেখি না, কোথাও গিয়েছিলি?

—ছেলে বাড়ি এসেছে অনেকদিন বাদে।

—সে খবর জানি। তোর ডলারের ছেলে শুনলাম জিনিসপত্র কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলেছে! সত্যি! ভাগ্যি করে এসেছিলি! আর আমার অবস্থা দেখ, সারাদিন খাই খাই চলছে। লোভীর মত শুনতে থাকেন মনীষা ওই খাই খাই সংসারের গল্প। ভাবেন নিজের কথা।

এক-একবার ছেলে আসে আর এটাসেটা কিনে ফেলে, বাড়ি প্রায় নানা সরঞ্জামে ভর্তি হয়ে গেল! এসেই কত রকমের খাবার জিনিসই কিনে ফেলবে। ওরই কেনা বিরাট ফ্রিজে সে সব ভর্তি করবে। একবারও ভাবে না—এতসব খাবে কে? সে নিজে আর কদিন থাকে! নষ্ট হয় প্রচুর। কাজের লোক মাত্র একজন হরির মা, সেও বুড়ো মানুষ, কতই বা খাবে? আরও লোক রাখার কোনো যুক্তিই নেই, ছেলে বুঝতে চায় না। আসলে অপচয় করার অভ্যাস তার নেই, প্রয়োজন নেই, ছেলের কাছে এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার!

—তারপর? এবার চললি নাকি ছেলের কাছে?" ভারি লজ্জা পান মনীষা— 'আরে দূর! সেখানে সব অচেনা, তাদের সঙ্গে কতক্ষণ কাটানো যায়? গেলেও ওই দু-দশ দিন, এই সংসার ফেলে যাওয়াও অত সোজা নাকি?' কেউই বিশ্বাস করে না এসব কথা, স্বর্গের আমন্ত্রণ কেউ ইচ্ছা করে উপেক্ষা করে? ভেতরে নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে। করুণা আবার বলে— 'তা বলে কদিন বিদেশে ঘুরবি না? এবারেই না হয় ছেলের সাথে চলে যা।' আরো কিছু সাংসারিক জ্ঞান দিয়ে অন্য পথ ধরে। কদিনে এই হইহল্লোড়ে বুম্বা আরও কত কাণ্ড করেছে। টিভিতে সেদিন উত্তম-সুচিত্রার ছবি হচ্ছে। হাতের কাজ এমন কিছু নেই, লম্বা বিজ্ঞাপনের সময়ে সেটা অনায়াসেই করে ফেলা যাবে ভেবে মনীষা ছবি দেখতে বসে যান। বুম্বা কোথা থেকে খানিক ঘুরে এসেছে সাইকেল চেপে। ওকে দেখে এবার মনীষা ডাকেন— 'আয় দেখ, উত্তম-সুচিত্রার বই হচ্ছে। এমন নায়ক আর নায়িকা আর হবে? এখন যা সব বের হচ্ছে! বাপরে বাপ দেখতেই ইচ্ছা করে না!' বুম্বা অত সহজে একথা মেনে নিতে পারে না— মায়ের সঙ্গে অনেক তর্ক করে কিন্তু উত্তম নায়ক আর অন্য নায়কের মধ্যে তুলনা করে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়, সেই হেরে যাওয়া এক মোক্ষম পয়েন্ট। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সঙ্গে সব কথাই বলা চলে, মনীষা সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা সামারি করে ফেলেন— 'সিনেমার গল্পের সারাংশ হচ্ছে হয় নায়ক নয় নায়িকা একে অপরের প্রেমে পড়বে। মাঝে নানা উপদ্রব ঘটাবার লোক এসে জড়ো হবে। ভালো মতো ঘোঁট পাকাবার পর আস্তে অস্তে জট খুলবে, তখন মিলনান্তক। কিন্তু জট খুলতে খুলতেই ভাবাবেগ কেউ কেউ সাংঘাতিক কিছু করে ফেলে, তখন বিয়োগান্তক। তবে উত্তম-সুচিত্রার বই হলে সবাই নিশ্চিন্ত

সৃষ্টিসন্ধান

মিলনান্তক হবেই।'

বুম্বা হো হো করে হাসতে থাকে, বলে, 'তোমার বিশ্লেষণের তুলনা নেই মা! কিন্তু তখন নায়িকাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হচ্ছে কীসে?'

— 'কীসে মানে? এক কথায়। সেই সব নায়িকা ভ্রুভঙ্গি করে নায়কের দিকে একবার তাকালেই ব্যাস! নায়ক একেবারে কাত! সারা জীবনের জন্য যেন কেনা!' বুম্বা হাসতে হাসতে বলে, 'আর এখন?'

— 'এখন? ছ্যা ছ্যা! এক বোঁচাখোঁচা নায়ক, সে আবার কোনও মতেই নায়িকার দিকে ভিড়তে চায় না! চাইবে কী? সেটাই বা কী বস্তু! তখন ফুলের বাগানে প্রায় সব জামাকাপড় খুলে নায়িকা নাচগান শুরু করে, গাইতে গাইতে পায়ে ধরে পিছন থেকে ঝুলে পড়ে। ফল সেই একই, গানের শেষে নায়ক ওঠে ঠেলে দিয়ে চলে যায়।' বুম্বার হাসিতে ঘর ফেটে যায় আর কী। ওর সঙ্গে মা-ও হাসে। একটা নিঃশ্বাস পড়ে। ভাবেন এইটুকুই তো সম্বল! এরপরেই তো পাগলটা এক ভি সি ডি লেয়ার আর প্রচুর পুরনো ছবির সি ডি কিনে আনল— কদিন ধরে ওগুলো চালিয়ে রাখল। মাকে সারাক্ষণ বসে থাকতে হবে, নড়াচড়া চলবে না।

এবার এল অনেকদিন পর। সেই ছটফটে ছেলেমানুষি ভাবটা নেই, যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে। এক-একটা জিনিসের দিকে তাকান মনীষা আর ভাবেন এত কীসের প্রয়োজন। ওদের যার জন্য দুশ্চিন্তা, সাজসরঞ্জামে ঘর ভরা, ব্যবহার করার অবকাশ নেই বা প্রয়োজন বোধই নেই। এসব চালাবার নানা কায়দাকানুন শিখে মনে রাখাও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ছেলের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত দেখে আতঙ্ক হয় আবার না জানি কী এনে হাজির করবে! শেষে বলেই ফ্যালেন— 'হ্যাঁরে এখানে এত হাবিজাবি জিনিস আনিস ওখানে চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না তো তোর? আমার বড় চিন্তা হয়।"

— 'ওঃ তোমাকে বুঝিয়ে পারা যায় না মা! পকেটে শুধু ক্রেডিট কার্ডটা রাখলেই হল, কেনাকাটা করো, খাওদাও যা খুশি— নগদ দেবার ঝামেলা নেই!"

— 'তা বলে এত ধার করবি?'

— 'মা, সভ্যজগতে তারই খাতির মানসম্মান সবচেয়ে বেশি যে যত বেশি ধার পেতে পারে তার ওপর! বুঝলে?' শুনে কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় মনীষা। মহাভারতের সেই বকরূপী ধর্মের প্রশ্ন আর তার উত্তর এযুগে কি আর চলে না? ধর্ম বলেছেন—

'কীবা বার্তা কী আশ্চর্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে।'

যুধিষ্ঠির ধর্মরূপী বককে সুখের সজ্ঞা দিয়ে গেছেন—

'অপ্রবাসে ঋণবিনা যার দিন যায়।
যদ্যাপি মধ্যাহ্নকালে শাক অন্ন খায়
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।'

ওদের বোঝানো গেল না কিছুতেই যে, দেশে থেকেই যা উপার্জন হত ভালোভাবেই চলে যেত সংসার। এই পথের দিকে চেয়ে থাকার আর দিন গোনা— কৃতী সন্তান হওয়ার দরকার কী? করুণা কেমন ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, বাড়িটা সর্বক্ষণ কলকল করছে। কীসে তৃপ্তি? কী চেয়েছিলেন তিনি?

যেই শুনল বুম্বা যে খরচ বেশি হয় বলে মা ফোন করতে চান না অমনি বকাবকি করে আলমারি থেকে ল্যাপটপ বের করে টেবিলে গোছগাছ করে দিয়ে বলল— 'মা, এদিকে দেখে যাও, কত সোজা ই-মেল পাঠানো।' মা কাছে আসতেই পটপট এটাসেটা টিপে এক। বলল— 'বুঝেছ তো? সময় কোনও ব্যাপারই নয়।' একটু আমতা আমতা করে মনীষা বলেন— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ আর এমন কী শক্ত, দিব্যি বোঝা যায়।' বুম্বা নিজের জায়গায় ফিরে গেছে তাও অনেকদিন হল।

পাশের বাড়ির সঞ্জয় কম্পিউটার শেখে। এটা পড়ে আছে দেখে এখানেই বসে হাত পাকায়। ডাক শুনল মনীষা- 'মাসিমা কাজে বসছি'।

— 'তা বোস, একটা মেল পাঠিয়ে দে না বুম্বাকে, আর খুলে দেখ ও কিছু পাঠিয়েছে কিনা, গত সপ্তালে তো খুলিসনি।'

নাড়াচাড়া করে ও বলল, 'না কিছু নেই। দাদা এত ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে তাও তুমি বসবে না, এসো এখানো।' মনীষা একটু এগিয়ে যন্ত্রটার সামনে বসে। 'এবার নিজের হাতে মেল পাঠাও, দেখো কিছু শক্ত নয়। এই যে A B C D সব লেটারগুলো রয়েছে এগুলো খালি টিপলে, যা বলতে চাও।' হঠাৎ সাহস পেয়ে যান মনীষা, এই অক্ষরগুলো টিপে টিপে মনের সব কথাই লিখে ফেলতে পারবেন, সোজা কাজ কিন্তু বারে বারেই চোখে জল এসে যায়। তা সত্ত্বেও লেখা শেষ করেন, আরো অনেক কিছু লিখে ফেলতে ইচ্ছা করে কিন্তু হাত আর ওঠে না। খানিকক্ষণ বসে থেকে এবার উঠে চলে যান। সঞ্জয় বলে, 'দেখি কী লিখলে।' লেখাগুলো তলার দিকে তাই খচ করে চাবি টিপতেই পর্দায় ভেসে ওঠে— Tora Bhalo Thakis.

সৃষ্টিসন্ধান